1

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে বাঙালির সমাজ-সংসার জীবনের যে ছবি পাওয়া যায় তার পরিচয় দাও।

অথবা

কবিকঙ্কণ মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গলের আখেটিক খণ্ডে সেকালের বাঙালির সংসার-সমাজ জীবনের নানা ছবি পাওয়া যায় - তথ্য সহকারে আলোচনা কর।

সাহিত্য মানবজীবনের রূপালেখ্য। সমাজকে ঘিরেই মানবজীবনের বিবর্তন। তাই সাহিত্যে ফুটে ওঠে সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি। আর সাহিত্যিক যেহেতু একজন সামাজিক মানুষ তাই তাঁর ইচ্ছায়-অনিচ্ছায়, জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে সমাজের বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ করা যায়।

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই সেখানে মানুষের পরিবর্তে দেবতার প্রাধান্য। তবে সেইসব সাহিত্যে দেবতার আড়ম্বর ছাপিয়ে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে সামাজিক পরিবেশের মাঝখানে মানুষের সুখ-দুঃখের করুণ-মধুর কাহিনি। আমাদের আলোচ্য মুকুন্দের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যেও চণ্ডী উপলক্ষ্য মাত্র, - লক্ষ্য বাঙালি সমাজ এবং সামাজিক মানুষ।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আখেটিক খণ্ড ও বণিক খণ্ডে বাঙালি সমাজের দুই বিপরীত মেরুর জীবনকে মুকুন্দ চিত্রিত করেছেন। আখেটিক খণ্ডে ব্যাধ দম্পতি কালকেতু ও ফুল্লরার দারিদ্র্য জীবনের বর্ণনা; সেইসূত্রে বাঙালি সমাজের সংস্কার, আচার, বিভিন্ন প্রথা এবং বিচিত্র ধর্ম ও বর্ণের মানুষের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে বণিক খণ্ডে অভিজাত বাঙালির জীবন চিত্রিত হয়েছে, যাঁরা বন্ধুবর্গের সঙ্গে পায়রা উড়িয়ে বিলাসী জীবন যাপন করেন।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আত্মপরিচয় অংশে কবি আত্মবিবরণী দিতে গিয়ে তৎকালীন সময়ের যে রাজনৈতিক ও সামাজিক পালাবদলের কথা বলেছেন তাতে তা হয়ে উঠেছে সমকালীন বাংলাদেশের বিশ্বস্ত দলিল। বিশেষত বাংলায় ডিহিদার মাসুদ শরিফের অমানুষিক অত্যাচার, শোষণ, উৎপীড়নের যে বিভীষিকা নেমে এসেছিল তা কবির বর্ণনায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে। 'মাপে কোনে দিয়া দড়া / পনের কাঠায় কুড়া' অথবা 'খিল ভূমি লেখে লাল' কিংবা 'বিনা উপকারে খায় ধুতি' ইত্যাদি চরণে তৎকালীন বাঙালি জীবনের যে অরাজকতা নেমে এসেছিল তার পরিচয় ফুটে উঠেছে। আবার অনেক সময় টাকা ভাঙাতে গেলে টাকা প্রতি আড়াই আনা কম দিত। এমনকি অর্থাভাবে সাধারণ মানুষ ধান, গরু ইত্যাদি বিক্রি করতে পারতো না। কারণ সেই সামাজিক অচলাবস্থার দিনে কেউই এসব কিনতে রাজি ছিল না। আর ডিহিদার যে প্রজার কাছে কি ভয়াবহ ছিল তা কালকেতুর একটি উক্তিতে প্রমাণিত। গুজরাট নগর পত্তন উপলক্ষ্যে বুলান মণ্ডলকে কালকেতু বলেছে ----

''শুন ভাই বুলান মণ্ডল
আইস আমার পুর সন্তাপ করিব দূর
....
ডিহিদার নাহি দিব দেশে।''

আখেটিক খণ্ডে সমাজের একেবারে দরিদ্র অনভিজাত জীবনের ছবি এঁকেছেন মুকুন্দ, যারা দুবেলা ভরপেটা খেতে পায় না। এ প্রসঙ্গে ফুল্লরার বারমাস্যা একটি অনবদ্য ও আকর্ষণীয় অংশ। এক দরিদ্র পরিবারের বধূ, যারা সারা বছর ধরে তার দিনযাপনের গ্লানি, প্রতিটি মুহূর্ত নিদারুণ দারিদ্র্যের সঙ্গে অবিরত সংগ্রাম করে --- বারমাস্যা তারই বর্ণনা। ঐ বারমাস্যা অনেকটা অতিরঞ্জিত মনে হলেও হরগৌরির সংসার এবং কালকেতু ফুল্লরার সংসার তৎকালীন বাংলার বিত্তহীন সাধারণ মানুষের সংসারের বিশ্বস্ত চিত্র। আবার পুরুষরা শিকার করতে গেলে অধিকাংশ সময়ে ব্যাধ রমণীরা হাটে পসরা নিয়ে যেত, ফুল্লরা তার প্রমাণ।

ব্যাধখণ্ডে গুজরাট নগর পত্তন উপলক্ষ্যে মুকুন্দ যে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম-বর্ণের পরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর লোকচরিত্র জ্ঞান ফুটে উঠেছে। চৈতন্য বিভেদ বিরোধহীন যে জাতীয় মুক্তির পথ প্রদর্শন এবং প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, মধ্যযুগের সামাজিক জীবনের বিভিন্ন জাতিধর্মের সার্বিক মিলনচিত্রে তা একাব্যে ফুটে উঠেছে। তাই গুজরাট নগরে আমরা দেখি একই সঙ্গে ব্রাহ্মণ, শূদ্র, হিন্দু, মুসলমান পাশাপাশি বসবাস করেছে। নিজ নিজ বৃত্তি নিয়ে একীভূত হয়েছিল ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিক, মালী, ধীবর, ডোম, মুসলমান ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়। শিক্ষিত ব্রাহ্মণ যেমন ছিল তেমনি মূর্খ বিপ্রেরও অভাব ছিল না ----

"মুখ্য বিপ্র বৈসে পুরে নগরে খাজন করে
শিখিআ পূজার অনুষ্ঠান।
চন্দন তিলক পরে দেব পুজে ঘরে ঘরে
চাউলের কোচড়া বন্ধে টান।"

আবার চিকিৎসা বিদ্যায় পারদর্শী গুপ্ত, সেন পদবী যুক্ত বৈদ্যদের বর্ণনায় কবি বাস্তব নিষ্ঠা ও রসবোধের পরিচয় দিয়েছেন। মুসলমান সমাজের প্রসঙ্গে কবি তাদের মধ্যে হিন্দুদের অনুকরণে যে উপবর্ণের সৃষ্টি হয়েছে সেকথাও বলতে ভোলেননি। এদের মধ্যে জোলারা খুব একটা ধর্ম-কর্মের ধার ধারতো না। অন্যদিকে হাসনহাটির ধর্মনিষ্ঠ মুসলমানদের কবি ধর্মনিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছেন ------

"ফজর সময়ে উঠি বিছায়া লোহিত পাটি
পাঁচ বেড়ি করয়ে নামাজ।"
অথবা
"বড়ই দানি সম্বন্ধ না জানি কপট ছন্দ
প্রাণ গেলে রোজা নাহি ছাড়ি।"

সমাজচেতনা কতটা প্রখর হলে এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা কতটা গভীর ও ব্যাপক হলে বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের এমন নিখুঁত চিত্র ফুটিয়ে তোলা যায় তা ভাবলে বিস্মৃত হতে হয়ে।

আখেটিক খণ্ডে কালকেতু জন্মের পূর্বে নিদয়ার গর্ভসঞ্চার, সাধভক্ষণ এবং তার খাদ্যরুচির যে বিচিত্র তালিকা পাওয়া যায় তা আজও প্রায় অপরিবর্তনীয়। আবার কালকেতুর জন্ম ও নামকরণ উপলক্ষ্যে যেসব মাঙ্গলিক ক্রিয়া-কর্মের পরিচয় ফুটে উঠেছে তাতে তা আধুনিক সময়ের প্রতিরূপ বলেই মনে হয়। কালকেতুর জন্মের পর ছয়দিনে ষষ্ঠী; আটদিনে

অষ্টকলাই প্রভৃতি অনুষ্ঠান আজও সমাজে প্রচলিত। ছেলেমেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে যে ঘটক নির্ভরতা তা সমানভাবেই আজও সমাজে বর্তমান। এছাড়াও বিয়ের অধিবাস থেকে শুরু করে গায়ে হলুদ, মূল বিবাহ অনুষ্ঠান, বরযাত্রী সহযোগে কন্যাগৃহে যাত্রা, কুশহস্তে কন্যাদান, কুটুম্বভোজন, বাসরশয্যা - ইত্যাদি যাবতীয় আচার-অনুষ্ঠানের যে অনুপুঙ্খ বিবরণ মুকুন্দ দিয়েছেন তা শুধু সেকালের নয়, একালেরও সামাজিক ছবি। আবার আজকের মতো সেযুগেও সাধারণ মানুষ ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। যার প্রমাণ আমরা পাই ফুল্লরা সম্পর্কিত একটি উক্তিতে - ''বাম বাহু স্ফুরে তার নাচে বাম আঁখি।''

মুকুন্দের সমকালে বাঙালি নারী সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল সতীন সমস্যা। ফুল্লরার বারমাস্য বর্ণনার মধ্যেই সপত্নী সমস্যার বীজ লুকিয়ে আছে। সতীন সমস্যা থেকেই আমরা অনুমান করতে পারি যে সমাজে বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। ছদ্মবেশী দেবীকে সপত্নী ভেবে ফুল্লরার কালকেতুর সামনে কান্নাকাটি করলে কালকেতু সান্ত্বনার সুরে বলে -

''শাশুড়ি ননদী নাহি নাহি তোর সতা
কার সনে দ্বন্দ্ব করি চক্ষু কইলি রাতা।''

এই বাক্যে যেমন সতীন সমস্যার বিষয়টি ফুটে উঠেছে তেমনি শাশুড়ি ননদের হাতে অসহায় বধূ নির্যাতনের ইঙ্গিতটিও সুস্পষ্ট।

আবার তৎকালীন সমাজে ঘরজামাই প্রথা প্রচলিত ছিল এবং অনেক সময়ই শাশুড়িরা ঘরজামাই রাখাতে বিরক্ত হত - সে প্রমাণও একাব্যে পাওয়া যায়। ঘরজামাই শিবের জন্য কন্যা গৌরির প্রতি মেনকার যে বিরক্তিপূর্ণ উক্তি তাতে এই সমস্যা অনেকটাই জীবন্ত -

''রান্ধি-বাড়ি আমার কাঁকালে হইল বাত
ঘরে জামাই রাখিয়া যোগাব কত ভাত।''

অন্যদিকে বণিক খণ্ডে আমরা অভিজাত বাঙালি সমাজের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হতে দেখি। সেখানে ধনপতি সদাগর পায়রা উড়িয়ে দিনযাপন করেন। বাঙালিরা যে কেবল ঘরের মধ্যেই পড়ে থাকত না, বাইরে বিপুল সওদাগরি জীবন যে তাদের আকর্ষণ করতো ধণপতি শ্রীমন্ত তার পরিচয় বহন করে।

তবে ব্যাধখণ্ডের সঙ্গে বণিকখণ্ডের মিল রয়েছে নারী সমস্যা চিত্রণে - দুই খণ্ডেই সতীন সমস্যা বিষয়টি চিত্রিত। আর একটু বেশি করে বললে বলতে হয় আখেটিক খণ্ডে দুই সতীনের দ্বন্দ্ব নেই, আশঙ্কা আছে মাত্র। কিন্তু বণিক খণ্ডে খুল্লনা ও লহনার পারস্পরিক ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়ায় এই সমস্যা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। খুল্লনার সমগ্র জীবন যেন ট্র্যাজেডির এক অখণ্ড প্রবাহ। তার একদিকে আছে সতীন লহনার দুঃসহ যন্ত্রণা এবং অন্যদিকে স্বামী বিরহ। এককথায় বাঙালি গার্হস্থ্য জীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন্ত ছবি তুলে ধরতে গিয়ে কবি দুই নারীর মধ্যে যে পারস্পরিক ঈর্ষা বিবাদকে দেখিয়েছেন তা বেশ প্রশংসনীয়।

সে সময় বাল্যকাল থেকেই শিশুদের বিদ্যাভ্যাস শুরু হত। শ্রীমন্তের বিদ্যারম্ভ অংশটি তার প্রমাণ। আবার এ অংশে সেকালের পাঠকগণের তালিকা পাওয়া যায় - দেশে পণ্ডিতের অভাব ছিল না - পণ্ডিত দলাই ওঝা এবং জনার্দন ওঝা তাদের সাক্ষাৎ প্রতিনিধি আবার মুসলমান ছাত্ররাও যে পড়াশোনা করতো এমন প্রমাণ পাওয়া যায়।

তৎকালীন সমাজে যে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল তার প্রমাণ পাই ব্রাহ্মণী কর্তৃক লহনার হয়ে খুল্লনার নিকট পত্ররচনা। আবার খুল্লনার যে অক্ষর জ্ঞান ছিল তার প্রমাণ ধনপতির চিঠি যে জাল সে সহজেই বুঝতে পেরেছিল। আবার লহনার সই লীলাবতী সুশিক্ষিতা এবং পত্রলেখন নিপুনা নারী ছিলেন একথা জানা যায়। অন্যদিকে দুবলা দাসীও স্বচ্ছন্দে বাজার করার হিসাব দিয়েছে ধনপতির কাছে।

এসকল আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি যে কবিকঙ্কণ তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেকালের সমাজ সংসারের যে ছবি তুলে ধরেছেন তা সমগ্র বাংলাদেশের না হলেও তাঁর ব্যাপক সামাজিক অভিজ্ঞতা ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির গুণে সে অংশবিশেষের মধ্যেই পরিপূর্ণতার আভাস ফুটে উঠেছে। আত্মবিবরণী অংশে আমরা যেমন তৎকালীন সামাজিক বিশৃঙ্খলার ছবি পাই, ব্যাধখণ্ডে সাধারণ অনভিজাত মানুষের জীবনচিত্র প্রতিফলিত হতে দেখি তেমনি বণিক খণ্ডে ফুটে উঠতে দেখি অভিজাত বাঙালি জীবনের রূপালেখ্য। এককথায় রূপদর্শী ও জীবনরস রসিক কবি মুকুন্দের তুলির টানে তৎকালীন অভিজাত ও অনভিজাত বাঙালির সমাজ-সংসারের পরিপূর্ণ ছবি জীবন্ত ও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

— চন্দন কুমার মান্না
বিভাগীয় শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, খেজুরী কলেজ,